ডায়রিয়া প্রতিরোধ ... ২
শিশুর পুষ্টি ... ৩
পরিবার পরিকল্পনা ... ৫
হুপিং কাশি ... ৮

ISSN (ISO 3297)

স্বাস্থ্য সংলাপ

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

বর্ষ ১ সংখ্যা ৩ পৌষ ১৩৯৯

সবুজ শাক শিশুর দৃষ্টি শক্তি বাঁচায়

ডাঃ মুজিবর রহমান

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে শিশুদের অসুখের একটি অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে ভিটামিন এ'র অভাব। সারা বিশ্বে প্রতি বছর ৬ বছরের কম বয়সের প্রায় ১০ লক্ষ শিশু এই ভিটামিন এ'র অভাবে অন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং আরও এক কোটি শিশু চক্ষু রোগে (জেরোপথালমিয়া) ভুগছে। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন গবেষণায় দেখিয়েছেন, যেসব শিশুদের ভিটামিন এ'র অভাব রয়েছে তাদের ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, হাম প্রভৃতি রোগ বেশী হয় এবং তাদের মৃত্যু হারও বেশী। ইন্দোনেশিয়ায় এক গবেষণায় দেখানো হয়েছে, যেসব শিশুদেরকে প্রতি ৬ মাস পর একবার ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয় তাদের তুলনায় যাদেরকে কোন ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয় না তাদের মৃত্যু হার ৩০% বেশী।

সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার এই যে কেবলমাত্র আমাদের সচেতনতার অভাবে একটি শিশু চিরদিনের জন্য তার অমূল্য দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলছে। আমাদের এই সবুজ দেশে ভিটামিন এ'র অভাব নেই। সবুজ শাক পাতায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণ বিটা-কেরোটিন যা খাওয়ার পর ভিটামিন এ-তে পরিবর্তিত হয়। সারা বছরই আমাদের দেশে কোন না কোন শাক-সব্জি পাওয়া যায়। ফলমূল এবং মাছ-মাংসে প্রচুর ভিটামিন এ থাকলেও এগুলো ব্যয়বহুল। কিন্তু সবুজ পাতা শাকে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন এ এবং এগুলো তুলনামূলকভাবে অনেক সস্তা। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে কচু শাক, কলমি শাক, পুঁই শাক ইত্যাদি শাক জন্মে। শহরে পাতা শাক কিনতে হলেও মাছ-মাংসে ও অন্যান্য সব্জি তুলনায় তা অনেক সস্তা।

আমাদের অনেকের মধ্যে একটা ভুল ধারণা আছে যে শাক খেলে বাচ্চার পেটের পীড়া কিংবা হজমের অসুবিধা হয়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে শিশুরা ৭০% শাক হজম করতে পারে এবং মাত্র ৪০ গ্রাম শাক ২-৩ গ্রাম (চা চামচের এক চামচের সামান্য বেশী) তেল দিয়ে রান্না করে খেলেই শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন এ পাওয়া সম্ভব। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, শরীরে ভিটামিন এ পরিপাকের জন্য শাক-সব্জি অবশ্যই তেল দিয়ে রাঁধতে হবে, কারণ এই তেল ভিটামিন এ পরিশোষণে সাহায্য করে।

মায়ের দুধ শিশুদের অন্যান্য পুষ্টির সাথে সাথে ভিটামিন এ'র চাহিদা পূরণ করে। শিশুরা মায়ের দুধ থেকে তাদের প্রয়োজনের প্রায় ৭০% ভিটামিন পায়। কিন্তু শিশু বড় হয়ে ওঠার সাথে সাথে মায়ের দুধের পাশাপাশি অন্য খাবার দরকার। শিশুর বয়স যখন ৫-৬ মাস তখন থেকেই শিশুদের আলগা খাবারের সাথে সাথে কিছু শাক খাওয়ানোর অভ্যাস করাতে হবে। আর যেসব শিশুরা মায়ের দুধ মোটেও পায় না, তাদেরকে বেশী পরিমাণে অন্যান্য খাবারের সাথে শাক খাওয়াতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, শাক-সব্জি খেলে শিশুদের হজমে কোন অসুবিধা হয় না। নিয়মিত শাক-সব্জি খাওয়ালে শিশুর চোখ রক্ষা পাবে এবং সেই সাথে তার রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বেড়ে যাবে। তাই "আপনার বাচ্চাকে নিয়মিত শাক খাওয়ান এবং শিশুর চোখ বাঁচান"। ■

প্রতিদিন সবুজ শাকসব্জি তেল দিয়ে রান্না করে শিশুকে ভাতের সঙ্গে খাওয়ালে শিশুর দৃষ্টি শক্তি রক্ষা পায় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে।

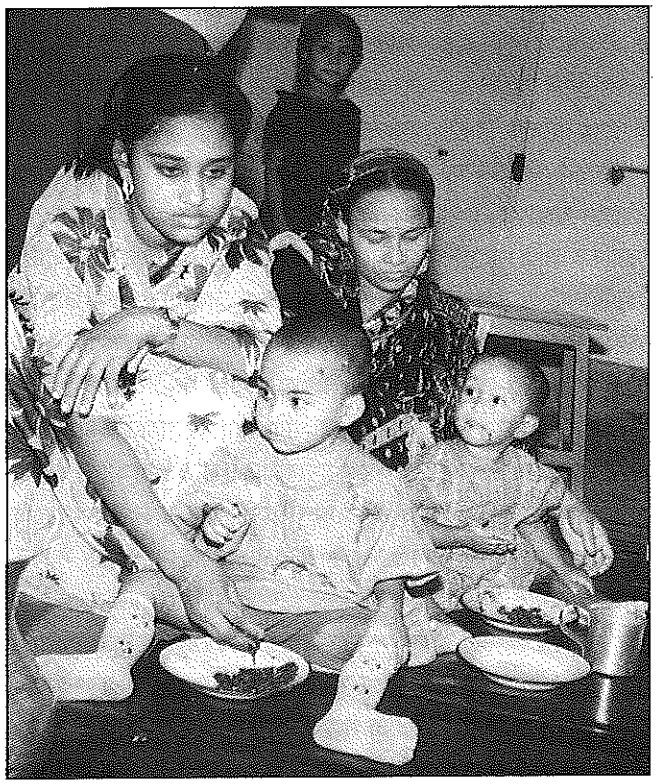

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে ১১ কোটি। এই বিপুল জনগোষ্ঠির প্রায় অর্ধেক মহিলা। প্রতিবছর ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ নতুন শিশু জন্ম নিচ্ছে। দেশে শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১১০ জন এবং মাতৃ মৃত্যু হার প্রতি হাজারে ৬ জন। মা ও শিশু মৃত্যুর হার যদিও পূর্বের তুলনায় অনেক হ্রাস পেয়েছে তবুও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর তুলনায় এই হার অনেক বেশী। পৃথিবীর অনেক দেশে মা ও শিশু মৃত্যুর হার অনেকটা শূন্যের কোঠায় কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। এমনকি নিকট দেশ শ্রীলংকার ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। বাংলাদেশে মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সংক্রান্ত উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে। দেশের প্রায় শতকরা ৬৫ ভাগ শিশু সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচীর আওতায় এসেছে। মায়েদের গর্ভকালীন সময়ে টিকা দেয়ার ফলে টিটেনাস জনিত কারণে মা ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগ ছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন শিশু ও নারী অধিকারের কথা বলছেন। এর পরেও মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যায় আমরা এত পিছিয়ে কেন? এ প্রশ্নের অনেক জবাব দেয়া যায়। তবে যে কথাটি সত্য তা হচ্ছে সরকারের সীমিত সম্পদের মধ্যেও উদ্যোগের অভাব নেই, অভাব নেই কর্মীর, কিন্তু অভাব শুধু ব্যাপক সচেতনতার। প্রত্যেক জাতির ক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত প্রবাদ রয়েছে—আর তা হচ্ছে "শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ", "সুস্থ মা সুস্থ সন্তান" ইত্যাদি। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ সোসাইটি অব প্রিভেনশন এ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন অব দি কনজেনিটালী ডিসএ্যাবলড-এর এক রিপোর্টে বলা হয় যে দেশের মাত্র শতকরা ৩ ভাগ শিশু হাসপাতালে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পায় এবং ভূমিষ্ঠ শিশুদের শতকরা ২ ভাগ জন্মগত পংগুত্ব নিয়ে পৃথিবীর বুকে আসে। এই একটি মাত্র পরিসংখ্যানের পর্যালোচনা করলে বাংলাদেশে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যাবে। এছাড়া দেশের প্রায় শতকরা ৬৫ ভাগ লোক অপুষ্টির শিকার। অধিকাংশ মায়েরাই রক্তশূন্যতা জনিত সমস্যায় ভোগেন। আমরা বলেছি সরকারের সীমিত সম্পদের মধ্যেও উদ্যোগের অভাব নেই। বেসরকারী পর্যায়েও মা ও শিশু স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মসূচী রয়েছে। যদি কর্মসূচীর যথাযথ বাস্তবায়ন ও মায়েদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারা যায় তবে অর্থ ব্যয়ে যা সম্ভব হচ্ছে না তা সচেতনতার মাধ্যমে সম্ভব হতে পারে। সুতরাং সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে মায়েদের ব্যাপকভাবে সচেতন করতে হবে। তবেই মা ও শিশু স্বাস্থ্যের কাঙ্খিত উন্নয়ন সম্ভব।

ডায়রিয়া প্রতিরোধের অপরিহার্য উপায়

ডাঃ কে.এম.এ. আজিজ, ডাঃ আর.বি. স্যাক ও
ডাঃ এম.আর. ইসলাম

ডায়রিয়া রোগীর মলে অসংখ্য জীবাণু থাকে। এই জীবাণু খাদ্য বা পানীয়ের সাথে পেটে গেলে ডায়রিয়ার আক্রমণ হতে পারে। প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন না করলে একজন ডায়রিয়া রোগী থেকে অন্যরাও সংক্রমিত হতে পারে। নিচে কয়েকটি স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে বলা হলো যা মেনে চললে ডায়রিয়ার বিস্তার অনেকাংশে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

১. হাত ধোয়া

পায়খানার পর পরিষ্কার পানির সাথে সাবান বা ছাই দিয়ে হাত কচলিয়ে ভালভাবে ধুয়ে নিতে হবে। এছাড়া খাবার হাত দিয়ে ধরা, নিজে খাওয়া ও শিশুদেরকে খাওয়ানোর আগে পরিষ্কার পানির সংগে সাবান দিয়ে ভালভাবে হাত ধুতে হবে। সাবান ছাড়া ধুলে অবশ্যই বেশি বেশি পানি ব্যবহার করে হাত কচলিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। বয়সে বড় পরিবারের সদস্যগণ অল্প বয়স্ক শিশুদের হাত ধুয়ে দেবেন।

২. মল ফেলার ব্যবস্থা

পায়খানার পর মলদ্বার ধোয়ার জন্যে কোন পুকুর বা নদীর ধারে যাওয়া যাবে না। প্রতিবার মলত্যাগ করে ছাই বা মাটি দিয়ে মলকে ঢেকে দিতে হবে, যাতে রোগের জীবাণু ছড়াতে না পারে। মলত্যাগের জন্য এমন একটি নির্দিষ্ট স্থান ব্যবহার করতে হবে যা থেকে পানির কোন উৎস দূষিত হতে না পারে। সকলের ব্যবহারের জন্যে একটি সেনিটারি পায়খানা বসিয়ে নিতে

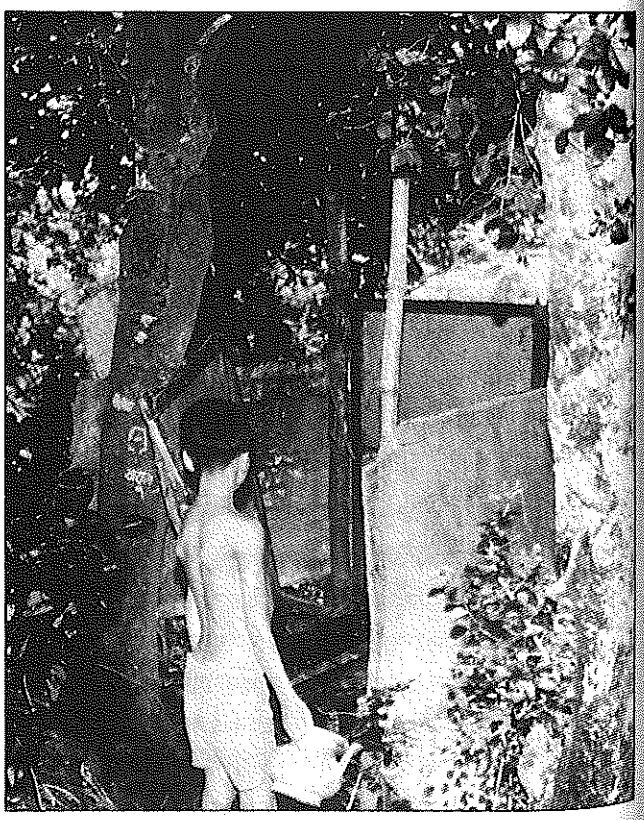

ফাইল

পরিবারের সকলেরই মলত্যাগের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা উচিৎ।

হবে। সেনিটারি পায়খানা সরকারী ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরী হচ্ছে ও বিক্রয় কেন্দ্র থেকে স্বল্প মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে। অল্প পরিমাণ পানি দিয়ে এটি পরিষ্কার করে ধুয়ে নেয়া যায়। এর ব্যবহার মাছির উপদ্রব কমাতে সাহায্য করে। সেনিটারি পায়খানা ব্যবহারের সঠিক পদ্ধতি পরিবারের প্রত্যেক সদস্য বিশেষ করে শিশুদেরকে শেখানো উচিত। এর ব্যবস্থা করতে না পারলে পুকুর, খাল, নদী বা টিউবওয়েল থেকে দূরে গর্ত করে নির্দিষ্ট স্থানে পায়খানা তৈরী করে নিতে হবে। খাল, পুকুর বা নদীর পানিতে মলযুক্ত কাপড় বা কাঁথা ধোয়া যাবে না। পানির উৎস থেকে দূরে কোন স্থান বা পানির উৎস দূষিত করতে না পারে এরূপ স্থানে এসব কাপড় ধুতে হবে। প্রাপ্তবয়স্কদের মলের মতো শিশুদের মলও ক্ষতিকর। এই মল সেনিটারি পায়খানায় বা গর্ত করে তৈরী নির্দিষ্ট পায়খানায় ফেলে দিতে হবে।

৩. পরিস্কার পানির ব্যবহার

খাবার পানি এবং অন্যান্য সমস্ত কাজের জন্য টিউবওয়েলের পানি নিরাপদ। টিউবওয়েলের পানি পাওয়া না গেলে সিদ্ধ করার পর ঠাণ্ডা করে পানি ব্যবহার করা দরকার। পানি পরিষ্কার করে নেয়ার পদ্ধতি হিসেবে হেলোজেন টেবলেট ও ফিটকিরির ব্যবহার বহুল প্রচলিত। দশ সের পরিমাণের এক কলস পানিতে ৫ গ্রাম বা এক চায়ের চামচ পরিমাণ ফিটকিরি মিশিয়ে ৩ থেকে ৫ ঘন্টা অপেক্ষা করার পর পানি ব্যবহার করা যাবে।

ফাইল

খাবার এবং অন্যান্য সব কাজে ব্যবহারের জন্য টিউবওয়েলের পানি নিরাপদ।

৪. শিশুর খাবার

* মায়ের দুধ খেতে থাকলে ডায়রিয়ার ফলে যে জলশূন্যতা হয় তা প্রতিরোধে সহায়ক হয়।
* যদি মা যথেষ্ট পরিমাণে দুধ দিতে অসমর্থ হন তবে শিশুকে তার অভাব পুরণের জন্য সম্পূরক খাবার দিতে হবে।
* যেসব শিশুকে তোলা দুধ দেয়া হয়, এদের কারো ডায়রিয়া হলে তোলা দুধ দেয়ার পরও খাওয়ার স্যালাইন দিতে হবে।
* খাওয়ার আগে তোলা দুধ ফুটিয়ে নিতে হবে এবং রান্না করা খাবার গরম গরম খেতে হবে। ঠাণ্ডা খাবার পুনরায় খুব ভালভাবে গরম করে খেতে হবে।
* মাছি ও ধুলাবালি দ্বারা দূষিত হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্যে খাবার সবসময় ভালভাবে ধুয়ে দিতে হবে।

৫. হামের টিকা

শিশুর ৯ মাস বয়স হয়ে গেলে যত আগে সম্ভব হামের টিকা দিতে হবে। কারণ, হামে আক্রান্ত শিশু অতি সহজেই ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে থাকে।

সারাংশে বলা যায়, ডায়রিয়া সম্পর্কে সচেতনতা ও অবিলম্বে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে এর বিস্তার থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। ■

শিশুর পুষ্টি সম্বন্ধে কিছু কথা

আনোয়ারা হায়দার

পুষ্টি সম্বন্ধে কিছু কথা বলার আগে বলতে হয় পুষ্টি বলতে কি বুঝায়? সহজভাবে আমরা বলতে পারি, যে প্রক্রিয়ায় খাদ্য পরিপাক ও পরিশোষণ হয়ে দেহের কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়ে এবং দেহের ক্ষয়পুরণ, বৃদ্ধিসাধন এবং তাপশক্তি উৎপাদন করে তাই পুষ্টি।

আমাদের দেশে প্রতিবছর অনেক শিশু অপুষ্টিতে মারা যায়। পুষ্টিহীনতা বলতে সাধারণতঃ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব জনিত অবস্থাকে বোঝায়। পুষ্টিহীনতার ফলে মানুষের দেহের স্বাভাবিক ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসাধনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস ও অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপে বাধা প্রদান করে। পুষ্টিহীনতা বর্তমান বিশ্বের বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অন্যতম সমস্যা। সারা বিশ্বে প্রায় ১৫০ কোটি লোক পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। এদের অধিকাংশ হলো শিশু, কিশোর-কিশোরী, গর্ভবতী ও প্রসূতি মাতা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে এশিয়ায় গড় শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১০৫, আর ইউরোপে এই হার প্রতি হাজারে ২০ জন মাত্র। পুষ্টিহীনতার একক কারণ নিরুপণ করা সম্ভব নয়। পুষ্টিহীনতার বিভিন্ন কারণের মধ্যে মোটামুটিভাবে ৩টি কারণকে মুখ্য বলা যায় যা ছকের সাহায্যে নিম্নে দেখানো হলো ঃ

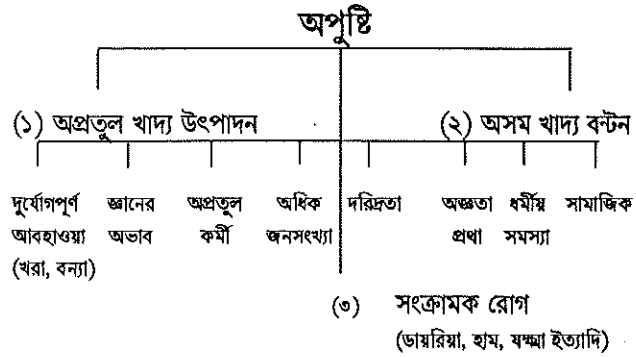

উল্লেখ্য, শিশুর পুষ্টিহীনতা অনেকক্ষেত্রে লাঘব করা যায়। একজন মহিলা যখন গর্ভবতী হন তখন তাঁকে দৈনন্দিন খাবারের দেড়গুণ বেশী খাবার

- রোগ শুরু হবার অল্প সময়ের মধ্যে রোগীর শরীরে জলশূন্যতার লক্ষণ দেখা দেয়।
- জলশূন্যতার প্রথম অবস্থায় রোগীর বেশী পানির পিপাসা থাকে। জলশূন্যতা যতো বাড়তে থাকে ততোই অন্যান্য লক্ষণ দেখা দেয়। এই লক্ষণগুলো হলো ঃ চোখ বসে যাওয়া, ছোট শিশুর মাথার চাদনী ডেবে যাওয়া, চামড়া ঢিলে হয়ে যাওয়া, ঘনঘন শ্বাস নেয়া, নাড়ি নিস্তেজ হয়ে যাওয়া এবং প্রস্রাব কমে যাওয়া।
- রোগ শুরু হবার সাথে সাথে খাবার স্যালাইন খাওয়ালে এই রোগ মারাত্মক অবস্থায় যেতে পারে না।
- বেশী জলশূন্যতা দেখা দিলে রোগীকে অবশ্যই হাসপাতালে পাঠাতে হবে।
- রোগীর বারবার বমি হতে থাকলে এবং খাবার স্যালাইনে যদি কোন উন্নতি দেখা না যায়, তাহলেও রোগীকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

কলেরা সমাচার

বেলায়েত হোসেন

গত শীতের শুরুতে গাঁয়ের বাড়ীতে প্রথম রাত কাটাতেই পাড়ার হালিম চৌকিদার খুব ভোরে হন্তদন্ত হয়ে হাজির। তার বৌয়ের ডায়রিয়া – মরে যায় যায় অবস্থা।

'ডায়রিয়া' শব্দটা এখন গাঁয়ে বেশ রপ্ত হয়ে গেছে। কলেরা বা ওলাওঠা গাঁয়ের লোক কখনো মুখে আনে না অমঙ্গল হয় বলে। আগে কোন গাঁয়ে কলেরা বা ওলাওঠা দেখা দিলে মানুষ ঐ গাঁয়ের পাশ দিয়ে হাঁটতো না। বছরে দু'টো সময়ে কলেরা মহামারী দেখা দেয়। শীত আসার আগে আর চৈত্র-বৈশাখ মাসের দিকে। বছরের এই দু'টো সময় ভালোয় ভালোয় কেটে গেলেই লোকে ঐ বছর রক্ষা পেলো বলে মনে করতো। শীত আসার আগে ছোট বেলা আমাদের হাতে ও কোমরে নীল সুতো আর হরিতকির খন্ডাংশ বেঁধে দিতো কবিরাজ। আমাদের গাঁয়ের সদরালী ফকিরের আস্তানার মাটি কপালের পাশে লাগিয়ে দেয়া হতো। প্রতি বছর এই আস্তানায় নিদান তাড়ানোর জন্য শিন্নী দেয়া হতো। হিন্দুরা সারা রাত জেগে ঢোল করতাল বাজিয়ে হরিনাম কীর্তন করেন।

মনে আছে, ছোট বেলা একবার বাবার সাথে কোথাও বেড়াতে যাচ্ছি, পথে এক গাঁয়ে কলেরা লেগেছে, বাবা ভীষণ উদ্বিগ্ন, সারা পথ ধরে আমাকে কি এক মন্ত্র মুখস্থ করালেন, তা এখন আর মনে করতে পারছিনে। এই মন্ত্র পড়লে নাকি কলেরা হয় না। গাঁয়ের লোকের বিশ্বাস, মন্ত্র, দোয়া-দরূদ, সুরা পড়া, পানি পড়া, কলেরা মহামারী বা যেকোন নিদান তাড়াতে পারে। আমি সেই অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলে – এক কালে যে কলেরার নাম শুনলে আঁতকে উঠতো, সে দীর্ঘকাল কলেরার জীবাণু নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, ভাবলে অনেকেই অবাক হবেন।

কলেরাকে ভয় পাবার কোন কারণ নেই। অনুবীক্ষণ যন্ত্রে কলেরা রোগীর মল পরীক্ষা করে অর্থাৎ জীবাণুর বিশেষ ধরনের নড়াচড়া লক্ষ্য করে অনায়াসেই কলেরার জীবাণু সনাক্ত করা যায়। কলেরা রোগীর পায়খানা উপযুক্ত খাদ্য মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে জীবাণুর বংশ বৃদ্ধি করে কলেরার জীবাণু চিহ্নিত করা যায়, আবার কলেরার জীবাণু সনাক্ত করে ওষুধের নমুনা প্রয়োগ করে পরীক্ষাগারে দেখানো যায় কিভাবে কলেরার জীবাণু বিনাশ করা সম্ভব এবং প্রমাণ করা যায় কলেরা কোন ওলাবিবি নয়— কলেরা এক কোষী অনুজীব, যাদের জীবন আছে, নড়াচড়া করে, খাবার খায়, বংশ বৃদ্ধি করে এবং মারাও যায়। বিষধর সাপকে যেমন সুদক্ষ সাপুড়েরা কৌশলে ধরে তাদের নিয়ে খেলা করে, বিষদাঁত ভেংগে দেয়, তেমনি কলেরাকেও বশে আনা যায়। মন্ত্র-তন্ত্রের কোন বালাই নেই। মানুষের বুদ্ধির কাছে এই রোগ এখন পরাজিত। অথচ অসাবধানতা এবং অসতর্কতার দরুন প্রতি বছর এই রোগে বহু লোক প্রাণ হারায়। কেবলমাত্র মুখ দিয়েই এই রোগের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে। মুখে যাতে জীবাণু প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। জীবাণু খালি চোখে দেখা যায় না। মনে রাখতে হবে, রোগীর মলমূত্র, বমি, বিছানাপত্র, পরিধেয় বস্ত্রাদি সবকিছুতেই জীবাণু রয়েছে। এই জীবাণু থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। সাবান দিয়ে ভালভাবে হাত ধুয়ে নেয়া এবং খাবার ও পানি যাতে জীবাণু মুক্ত থাকে তার জন্য সতর্ক হতে হবে। কলেরা বা ডায়রিয়া হওয়ার পর শরীর থেকে বমি বা পায়খানার মাধ্যমে যে পরিমাণ জলীয় পদার্থ বের হয়ে যায় তার সমপরিমাণ খাবার স্যালাইন খাওয়ালেই রোগীর মৃত্যুর তেমন কোন আশংকাই থাকে না। রোগী বেশী রকম জলশূন্যতায় পৌঁছলে কেবলমাত্র তখনই অন্তঃশিরা স্যালাইন প্রয়োগ করতে হয়। কলেরা বা ডায়রিয়া রোগী যা খেতে চায় তাকে তা খেতে দেয়া চলে। বাচ্চাদের বেলায় কোন অবস্থাতেই মায়ের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করা চলবে না। কলা, ডাব, চিড়ার মন্ড, চালের গুড়ার সরবত, সহজ পাচ্য সাধারণ খাবার-দাবার সবই খাওয়ানো যেতে পারে। কলেরা বা ডায়রিয়া মহামারীর সময়ে পানি যথাসম্ভব ফুটিয়ে পান করাই শ্রেয়। খাদ্যদ্রব্যে যাতে মাছি বসতে না পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। রোগীর মলমূত্র বিছানাপত্র ইত্যাদি যত্রতত্র জলাশয়ে ধোয়া উচিত নয়। মনে রাখতে হবে, এসবের মধ্যে কলেরা বা ডায়রিয়ার জীবাণু থাকে। সব অবস্থায় সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করতে হবে। আর ওই যে হালিম চৌকিদারের কথা বলছিলেম, তার বৌ-তো মরণের ঘর থেকে ফিরলো। একই নিয়মে কেবলমাত্র খাবার স্যালাইন, ডাব আর কলা খাইয়ে তাকে দিব্যি সুস্থ করে তোলা হলো। কোন মন্ত্র-তন্ত্র নয়, কলেরা বা ওলাবিবির হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি পালন করাই সহজ মন্ত্র।

পরিকল্পিত উপায়ে পরিবার গঠন এবং তার গুরুত্ব

ডাঃ ফকির আঞ্জুমান আরা

আমরা যেকোন কাজ করার আগে পরিকল্পনা করে থাকি। সুষ্ঠুভাবে কোন কাজ করতে হলে অবশ্যই কাজটি শুরু করার আগে সুচিন্তিত ও সঠিক পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। পরিবার গঠনের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। সুখী ও সুন্দর পরিবার গঠনে পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুর হার খুব বেশী অর্থাৎ প্রতি হাজারে প্রায় ১১০

স্বাস্থ্য কুইজ – ২ – এর উত্তর

উত্তর ঃ ১. না।

এসিডোসিস হওয়ার কারণে (যেহেতু পায়খানার সাথে বাইকার্বনেট বের হয়ে যায়) ডায়রিয়ার সময় বমি হয়ে থাকে। জলশূন্যতা এবং এসিডোসিস কমে গেলেই আপনা–আপনি বমি থেমে যায়। বমি বন্ধের ওষুধ ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।

উত্তর ঃ ২. কম পক্ষে এক লক্ষ কলেরা জীবাণুর আক্রমণে কলেরা হয়।

উত্তর ঃ ৩. ১৮৪৯ সালে জন স্নো আবিস্কার করেন যে কলেরা পানির মাধ্যমে ছড়ায়।

উত্তর ঃ ৪.

বয়স	ভিটামিনের পরিমাণ
০–৬ মাস (বুকের দুধ)	৩০০ মাইক্রোগ্রাম রেটিনল/প্রতিদিন
৬–১২ মাস	৩০০ মাইক্রোগ্রাম রেটিনল/প্রতিদিন
১–৩ বৎসর	২৫০ মাইক্রোগ্রাম রেটিনল/প্রতিদিন
৪–৬ বৎসর	৩০০ মাইক্রোগ্রাম রেটিনল/প্রতিদিন

উত্তর ঃ ৫.

— মনে পড়ার সংগে সংগে বড়িটি খেতে হবে।
— পরের বড়িটি ঠিক যখন খাওয়ার তখনই খেতে হবে।
— এক্ষেত্রে ২টি বড়ি একই সময়ে খাওয়া যায়। কোন অসুবিধা নেই।

যাঁদের স্বাস্থ্য কুইজ – ২ – এর উত্তর সঠিক হয়েছে ঃ

১. মোছাম্মৎ বিউটি
পিতা ঃ কাজী আঃ ছালাম
গ্রাম ও পোঃ : শিয়ালকোল
থানা ও জেলা ঃ সিরাজগঞ্জ

২. বীথি
প্রযত্নে– সেলিম ভুঁইয়া
গ্রাম ঃ বিলধলী
পোঃ : শিয়ালকোল
থানা ও জেলা ঃ সিরাজগঞ্জ

• সঠিক উত্তরদানকারী/বিজয়ীদের পুরস্কার ও সার্টিফিকেট ডাকযোগে পাঠানো হবে।

চিঠির জবাব

প্রশ্ন ঃ গুড় বা চিনি অথবা চাউলের গুড়া দিয়ে খাবার স্যালাইন তৈরীর পর ৬–৮ ঘন্টা পর্যন্ত রাখা যায় এবং প্যাকেট স্যালাইন ১২ ঘন্টা পর্যন্ত রাখা যায়। কিন্তু প্রথমটি কেন ১২ ঘন্টা পর্যন্ত রাখা যায় না বা ১২ ঘন্টার পরে খাওয়ানো যায় না?

উত্তর ঃ প্যাকেট স্যালাইনের উপাদানগুলো বিশুদ্ধ এবং প্যাকেটজাত করার সময় স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে উপাদানগুলো ব্যবহার করা হয়। যার ফলে প্যাকেটজাত স্যালাইন পানিতে মিশিয়ে তৈরী করার পর সেই স্যালাইন অন্য কোন জীবাণু দ্বারা দূষিত হবার সম্ভাবনা ১২ ঘন্টা পর্যন্ত কম থাকে। ১২ ঘন্টা পরে জীবাণু দ্বারা দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। ফলে ১২ ঘন্টা পর তৈরী করা স্যালাইন ফেলে দিতে হয়।

অন্য দিকে গুড় বা চিনি অথবা চাউলের গুড়া দিয়ে যখন ঘরে স্যালাইন তৈরী করা হয় তখন উপাদানগুলো তেমন বিশুদ্ধ থাকে না। কাজেই তৈরী করার ৬–৮ ঘন্টা পরে ঐগুলো জীবাণু দ্বারা দূষিত হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। বিশেষ করে চাউলের গুড়া দিয়ে ঘরে তৈরী স্যালাইন আমাদের দেশের আবহাওয়ার কারণে ৮ ঘন্টা পরে খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে যায়। এই কারণেই স্যালাইন ৬–৮ ঘন্টার পর কোন অবস্থাতেই ব্যবহার করা উচিত নয়।

প্রশ্ন ঃ প্যাকেট স্যালাইনের উপকরণে সোডিয়াম বাইকার্বনেটের এবং সোডিয়াম ট্রাই–সাইট্রেটের কোন পার্থক্য আছে কি?

উত্তর ঃ বর্তমানে বাংলাদেশে প্যাকেটজাত খাবার স্যালাইনের উপকরণের মধ্যে কোনটিতে সোডিয়াম বাইকার্বনেট এবং কোনটিতে এর পরিবর্তে সোডিয়াম ট্রাইসাইট্রেট ব্যবহার করা হয়। এই দু'রকমের প্যাকেটের স্যালাইনের মান ও কার্যকারিতা একই রকম। কাজেই যে কোনটি ব্যবহার করা যায়। তবে সোডিয়াম ট্রাই–সাইট্রেট মিশ্রিত প্যাকেট তুলনামূলকভাবে বেশী দিন সংরক্ষণ করা যায়। সোডিয়াম ট্রাই–সাইট্রেট শরীরে প্রবেশের পরে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সোডিয়াম বাইকার্বনেটে রূপান্তরিত হয়।

শিশুকে সফলভাবে মায়ের দুধ খাওয়ানোর জন্যে দশটি পদক্ষেপ

সন্তান প্রসব ও নবজাতকের যত্নের কাজে সেবাদানকালে অবশ্যই যা থাকা উচিত ঃ

১. মায়ের দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে একটি লিখিত নীতিমালা যা নিয়মিতভাবে সকল স্বাস্থ্য সেবাকর্মীকে অবহিত করতে হবে।

২. স্বাস্থ্য সেবাকর্মীকে এই নীতি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৩. সকল গর্ভবতী মাকে বুকের দুধ খাওয়ানোর সুফল ও ব্যবস্থাপনা অবহিত করতে হবে।

৪. জন্মের আধ ঘন্টার মধ্যে শিশুকে মায়ের দুধ দেয়ার জন্য মায়েদেরকে সহযোগিতা করতে হবে।

৫. শিশুকে কিভাবে মায়ের দুধ খাওয়াতে হয় এবং মায়েরা শিশুদের কাছে না থাকাকালীন অবস্থায় কিভাবে তা চালিয়ে যাওয়া যায়, তা মায়েদেরকে শেখাতে হবে।

৬. নিতান্তই চিকিৎসার প্রয়োজন ব্যতীত শিশুকে মায়ের দুধ ছাড়া অন্য কোন খাবার বা পানীয় দেবেন না।

৭. মা ও শিশুকে প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা একই সঙ্গে থাকতে দিন।

৮. শিশুর চাহিদামত বুকের দুধ খাওয়ান।

৯. মায়ের দুধে অভ্যস্ত শিশুদেরকে কোন কৃত্রিম টিট, পেসিফাইয়ার, ডামি দেবেন না।

১০. শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর সহযোগী দল গঠনে উৎসাহ দিন। মা হাসপাতাল বা ক্লিনিক ছেড়ে যাবার সময় এসব দলের কাছ থেকে পরামর্শ নেবার জন্য বলে দিন।

জেনে রাখা ভাল

বিষয় ঃ প্রাথমিক চিকিৎসা

কেরোসিন খেয়ে ফেললে কি করবেন ?

প্রথমে নিশ্চিত হতে হবে রোগী সত্যিই কেরোসিন খেয়েছে কিনা। কেরোসিন খেলে রোগীর মুখ পোড়া থাকতে পারে, শ্বাস-প্রশ্বাসে কেরোসিনের মত গন্ধ হতে পারে এবং নাড়ির গতি দ্রুত হতে পারে।

বমি করানোর চেষ্টা করবেন না। পাকস্থলীতে কেরোসিনের ঘনত্ব পাতলা করার জন্য রোগীকে দুধ খেতে দিন। ৫ বছরের নিচে হলে ১ গ্লাস এবং ৫ বছরের উপরে হলে ২ গ্লাস দুধ দিন। রোগীকে সংগে সংগে হাসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন। সেখানে পাকস্থলী থেকে নলের সাহায্যে কেরোসিন বের করা হয়। রোগী যদি বমি করেই, খেয়াল রাখবেন তা যেন ফুসফুসে চলে না যায়। কেরোসিন ফুসফুসের মারাত্মক ক্ষতি করে। সে জন্য রোগীকে উপুড় করে মাথা নিচের দিকে দিয়ে দেবেন।

পাকস্থলী পরিষ্কার করার পর রোগীকে গরম দুধ বা চা-কফি দেয়া যেতে পারে। নিউমোনিয়ার ভয় এড়াবার জন্য এন্টিবায়োটিকও দেয়া যায়।

হুপিং কাশি

সংলাপ রিপোর্ট

হুপিং কাশি একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। অনেকে এই রোগটিকে 'মেয়াদী কাশি' নামে চেনেন। শ্বাসনালীর এই রোগটির বৈজ্ঞানিক নাম 'পারটুসিস'। বর্ডেটেলা পারটুসিস নামক এক ধরণের জীবাণু দ্বারা এই রোগ হয়। রোগীর হাঁচি বা কাশির সাথে জীবাণু বাতাসে ছড়ায়। প্রতিবার কাশির সংগে কয়েক লক্ষ জীবাণু বের হতে পারে। বাতাসে ছড়ানো হুপিং কাশির এই ধরণের লক্ষ লক্ষ জীবাণু শ্বাসযন্ত্রের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে। এছাড়া আক্রান্ত রোগীর ব্যবহার্য কাপড়, তোয়ালে বা রুমালের সাহায্যে এই মারাত্মক রোগটি সংক্রমিত হতে পারে। যদিও রোগটি সব বয়সের লোকদের হতে পারে, তবে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের এই রোগ সবচেয়ে বেশী হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শিশুদের প্রতিরোধযোগ্য ৬টি সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে দেশে টিকায়নের ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হওয়ায় অন্যান্য সংক্রামক রোগের মতই হুপিং কাশির সংক্রমণের হারও কমে এসেছে।

রোগের লক্ষণ

হুপিং কাশি সাধারণ কাশি হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অনেক সময় প্রাথমিক অবস্থায় হুপিং কাশি সাধারণ কাশির মতই মনে হতে পারে। কিন্তু হুপিং কাশিতে আক্রান্ত শিশু কাশির দমকে ছটফট করে। সহজে এই কাশি থামতে চায় না। কাশির শেষে লম্বা শ্বাস নেয়ায় একটি শব্দ শোনা যায়। এই শব্দকে হুপ বলে। সাধারণ কাশিতে এই ধরনের কোন শব্দ শোনা যায় না। হুপিং কাশির জীবাণু শরীরে প্রবেশের ৭ হতে ১৪ দিনের মধ্যে রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। রোগের লক্ষণগুলো হচ্ছে জ্বর, খুসখুসে কাশি ও শ্বাসের সাথে এক ধরণের শব্দ (হুপ)। এই কাশি এক হতে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। এই রোগকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায় এক হতে দু'সপ্তাহ। এই সময় শিশুর নাক দিয়ে পানি পড়ে, সামান্য জ্বর ও শুকনা কাশি থাকে এবং শিশু কোন খাবার খেতে চায় না। এই পর্যায়ে রোগ নির্ণয় করা অনেক সময় সম্ভব নাও হতে পারে। পরবর্তী ২-৩ সপ্তাহ কাশির মাত্রা বাড়তে থাকে। শিশু বারবার প্রচন্ড কাশির পর লম্বা শ্বাস নেয়। শিশু বমি হতে পারে। কাশির দমক যখন ওঠে তখন শিশুর মুখ দিয়ে লালা বের হতে থাকে। শিশুর চোখ মুখ লাল হয়ে যায়। কাশতে ভীষণ কষ্ট হয়। এই পর্যায়ে আক্রান্ত শিশুর কাশতে কাশতে দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়। তৃতীয় পর্যায় হচ্ছে রোগের জটিলতা।

জটিলতা ও চিকিৎসা

এই রোগে আক্রান্ত শিশুর নিউমোনিয়া, অপুষ্টি, ব্রংকাইটিস ও মস্তিষ্কে জটিলতাসহ বিভিন্ন মারাত্মক উপসর্গ দেখা দিতে পারে। এই রোগ নির্ণয়ের পর সাধারণতঃ যেকোন কাশি নিবারক ওষুধ ও এরিথ্রোমাইসিন সেবনে রোগের মাত্রা কমে। তবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া শিশুকে ওষুধ দেয়া উচিত নয়। শিশু হুপিং কাশিতে আক্রান্ত হলে অত্যধিক দূর্বল হয়ে পড়ে এবং পুষ্টিহীনতায় ভুগতে পারে। এই সময় শিশুকে অল্প অল্প করে অধিক পুষ্টিকর খাবার দেয়া উচিত। এছাড়া আক্রান্ত শিশুর কাছ থেকে যাতে অন্য শিশু আক্রান্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এই ঘাতক রোগটিকে নির্মূল করতে হলে একমাত্র প্রতিষেধক ছাড়া গত্যন্তর নেই। শিশুকে দেড়মাস হতে এক বছরের মধ্যে প্রতিমাসে ১টি করে ডিপিটি ইনজেকশনের তিন ডোজ টিকা দেয়া হলে হুপিং কাশি সংক্রমণের ভয় থাকে না। এছাড়া ডিপিটি ইনজেকশনে ডিপথেরিয়া ও টিটেনাসের জীবাণু সংক্রমণের হাত হতেও শিশুকে রক্ষা করা যায়। ■

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ অধ্যাপক ডেমিসি হাবতে; **সম্পাদক ঃ** ডাঃ ফকির আঞ্জুমান আরা; **ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ঃ** এম. শামসুল ইসলাম খান; **কনসালটেন্ট এডিটর ঃ** ডাঃ এম. নজরল ইসলাম; **সদস্য ঃ** ইউসুফ হাসান, ডাঃ এ.এস.এম. মিজানুর রহমান, মুজিবুর রহমান ও ডাঃ সেলিনা আমিন; **সার্কুলেশন ম্যানেজার ঃ** হাসান শরীফ আহমেদ; **ডিজাইন ঃ** আসেম আনসারী।

প্রকাশক ঃ আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আই.সি.ডি.ডি.আর.বি), জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০। ফোন ঃ ৬০০১৭১-৮, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৮৩১১৬, টেলেক্স ঃ ৬৭৫৬১২ আই.সি.ডি.ডি. বি.জে।

মুদ্রণে ব্র্যাক প্রিন্টার্স ঢাকা বাংলাদেশ